ধর্মানুভূতির উপকথা

হুমায়ুন আজাদ

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় আজকাল, কথাটি হচ্ছে ‘ধর্মানুভূতি’। কথাটি সাধারণত একলা উচ্চারিত হয় না, সাথে জড়িয়ে থাকে ‘আহত’ ও ‘আঘাত’ কথা দুটি; শোনা যায় ‘ধর্মানুভূতি আহত’ হওয়ার বা ‘ধর্মানুভূতিতে আঘাত’ লাগার কথা। আজকাল নিরন্তর আহত আর আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে মানষের একটি অসাধারণ অনুভূতি, যার নাম ধর্মানুভূতি । মানুষ খুবই কোমল স্পর্শকাতর জীব, তার রয়েছে ফুলের পাপড়ির মতো অজস্র অনুভূতি; স্বর্গচ্যুত মানুষেরা বাস করছে নরকের থেকেও নির্মম পৃথিবীতে, যেখানে নিষ্ঠুরতা আর অপবিত্রতা সীমাহীন; তাই তার বিচিত্র ধরনের কোমল অনুভুতি যে প্রতিমুহূর্তে আহত রক্তাক্ত হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন সুদিন আসবে, সে আবার স্বর্গে ফিরে যাবে, তখন ওই বিশুদ্ধ জগতে সে পাবে বিশুদ্ধ শান্তি; সেখানে তার কোনো অনুভুতি আহত হবে না, ফুলের টোকাটিও লাগবে না তার কোনো শুদ্ধ অনুভুতির গায়ে। অনন্ত শান্তির মধ্যে সেখানে সে বিলাস করতে থাকবে। কিন্তু পৃথিবী অশুদ্ধ এলাকা, এখানে আহত হচ্ছে, আঘাত পাচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে তার নানা অনুভূতি– এটা খুবই বেদনার কথা; এবং সবচেয়ে আহত হচ্ছে একটি অনুভুতি, যেটি পুরোপুরি পৌরাণিক উপকথার মতো, তার নাম ধর্মানুভূতি। মানুষ বিশ্বকে অনুভব করে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে; ইন্দ্রিয়গুলো মানুষকে দেয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শ্রুতির অনুভূতি; কিন্তু মানুষ, একমাত্র প্রতিভাবান প্রাণী মহাবিশ্বে, শুধু এ-পাঁচটি ইন্দ্রিয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তার আছে অজস্র ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়। তার আছে একটি ইন্দ্রিয়, যার নাম দিতে পারি সৌন্দর্যেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে সৌন্দর্য; আছে একটি ইন্দ্রিয়, নাম দিতে পারি শিল্পেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে উপভোগ করে শিল্পকলা; এমন অনেক ইন্দ্রিয় রয়েছে তার, সেগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে প্রখর প্রবল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার ধর্মেন্দ্রিয়, যা দিয়ে সে অনুভব করে ধর্ম, তার ভেতরে বিকশিত হয় ধর্মানুভূতি, এবং আজকের অধার্মিক বিশ্বে তার স্স্লর্শকাতর ধর্মানুভুতি আহত হয়, আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভোরবেলা থেকে ভোরবেলা। অন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে পরাভুত ক’রে এখন এটিই হয়ে উঠেছে মানুষের প্রধান ইন্দ্রিয়; ধর্মেন্দ্রিয় সারাক্ষণ জেগে থাকে, তার চোখে ঘুম নেই; জেগে জেগে সে পাহারা দেয় ধর্মানুভূতিকে, মাঝেমাঝেই আহত

হয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে এবং বোধ করে প্রচণ্ড উত্তেজনা। এটা শিল্পানুভূতির মতো দুর্বল অনুভূতি নয় যে আহত হওয়ার যন্ত্রণা একলাই সহ্য করবে। এটা আহত হ'লে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মানুভূতির উত্তেজনা ও ক্ষিপ্ততায় এখন বিশ্ব কাঁপছে।

আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সুখকর অনুভূতি নয়; শরীরে আঘাত পেলে আমরা চিৎকার ক'রে উঠি। শরীরের থেকেও মনোরম যে-সব ইন্দ্রিয় আছে আমাদের, সেগুলো আহত হ'লেও চিৎকার ক'রে ওঠার কথা; তবে সেগুলোর চিৎকারের স্বর আমরা শুনতে পাই না।

> আমার অজস্র অনুভূতি দিনরাত আহত হয়; পত্রপত্রিকায় গ্রন্থে গ্রন্থে নিকৃষ্ট শিল্পকলাহীন কবিতার মতো ছোটো বড়ো পংক্তির প্রাচুর্য দেখে আহত হয় আমার কাব্যানুভূতি, নিকৃষ্ট লঘু অপন্যাসের লোকপ্রিয়তা দেখে আঘাত পায় আমার উপন্যাসানুভূতি; রাজনীতিবিদদের অসততা ভণ্ডামোতে আহত হয় আমার রাজনীতিকানুভূতি; এবং আমার এমন অজস্র অনুভূতি নিরন্তর আহত রক্তাক্ত হয়, আমি ওগুলোর কোনো চিকিৎসা জানি না, ওগুলো নিয়ে আমি কোন জঙ্গলে কোন রাস্তায় চিৎকার করবো, তাও জানি না। রাষ্ট্র এগুলোকে অনাহত রাখার কোনো ব্যবস্থা করে নি, রাষ্ট্রের মনেই পড়ে নি এগুলোর কথা।

রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব নয় আমার এসব অমূল্য অনুভূতিকে অনাহত রাখার সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেয়া? সবাই বলবে এটা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে তাকে খুলতে হবে একটি বিকট 'অনুভূতি মন্ত্রণালয়', যার কাজ হবে কোটি কোটি মানুষের কোটি কোটি অনুভূতির হিশেব নেয়া, সেগুলোর আহত হওয়ার সূত্র বের করা, এবং সেগুলোকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

> আমার শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভুতি রাজনীতিকানুভুতি কাব্যানুভুতি প্রভৃতি পাহারা দেয়া রাষ্ট্রের কাজ নয়, কিন্তু এখন রাষ্ট্র এক উদ্ভট দায়িত্ব নিয়েছে, মনে করছে ধর্মানুভূতি পাহারা দেয়া তার কাজ; তাই রাষ্ট্র দেখে চলছে কোথায় আহত হচ্ছে কার ধর্মানুভূতি।

আমার শিল্পানুভুতি সৌন্দর্যানুভুতি রাজনীতিকানুভুতি কাব্যানুভুতিকে কেনো রাষ্ট্র পাহারা দিচ্ছে না, কেনো আইন তৈরি করছে না এগুলোকে অনাহত রাখার? তার কারণ রাষ্ট্র শিল্পানুভূতি

সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে না, শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি হাস্যকর রাষ্ট্রের কাছে, বা রাষ্ট্র মনে করে শিল্পানুভূতি সৌন্দর্যানুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা যতোই আহত বা নিহত হোক, রাষ্ট্রের কিছুই করার নেই। কিন্তু ধর্মানুভূতি এমন তুচ্ছ হাস্যকর ব্যাপার নয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ; রাষ্ট্র এতে বিশ্বাস করে, তাই রাষ্ট্র একে অক্ষত রাখার জন্যে ব্যগ্র।

কিন্তু ধর্মানুভূতি কী বস্তু, যাকে অনাহত অক্ষত রাখার জন্যে রাষ্ট্র এতো তৎপর? বিজ্ঞান, গত কয়েক শতাব্দীতে, এগিয়েছে অনেক, এবং মহাবিশ্বের রূপ এখন আমরা জানি বৈজ্ঞানিকভাবে, যাতে কোনো অলৌকিক পুরাণ নেই; তবু আজো পৃথিবীকে আবৃত ক'রে আছে পৌরাণিক সংস্কৃতি। আমরা মানসিকভাবে আজো বাস করছি পৌরাণিক বিশ্বেই, যে-বিশ্ব প্লাতো, আরিস্ততল, টলেমি ও বিভিন্ন পৌরাণিক বইয়ের। মহাবিশ্বের পৌরাণিক রূপ বদলে দিয়েছেন কোপারনিকাস কেপলার গ্যালিলিও নিউটন আইনস্টাইন, যার সাথে কোনো মিল নেই পৌরাণিক বইগুলোর বিশ্বের, তবে আমাদের কল্পজগতে তার কোনো স্থান নেই, আমাদের কল্পজগত জুড়ে আছে পৌরাণিক বিশ্ব। ওই বিশ্ব চলে পৌরাণিক বিশ্বাসের নিয়মে, যদিও তা সম্পুর্ণ অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক বা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের কল্পজগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে চলছে বিরোধ; মানুষ এখন বাস করছে পুরাণ ও বিজ্ঞানের নিরন্তর বিরোধিতার মধ্যে। ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিলো পৌরাণিক মানুষের বিস্ময়বোধ, ভয়, ও লোভ থেকে; তারা কল্পনা করেছিলো বহু দেবতা, বহু বিধাতা, এক সময় অসংখ্য দেবতায় তারা ভ'রে ফেলেছিলো আকাশমণ্ডলকে। ওই সব দেবতাকে তারা ধ্রুব ব'লে মনে করতো, যারা মানতো না ওই সব দেবতা, তাদের পীড়ন করা হতো। তারপর মানুষ উদ্ভাবন করতে থাকে নতুন নতুন দেবতা বা বিধাতা, আগের দেবতা বা বিধাতাদের অসত্য ব'লে বাতিল ক'রে দেয়, যদিও এক সময় তারাই পুজিত হতো চরম সত্য ব'লে। দেবতা বা বিধাতায় বিশ্বাস, তার পুজো-আরাধনা ধর্মের একটি বড়ো ব্যাপার; তারচেয়েও বড়ো ব্যাপার হচ্ছে ওই সব বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিতার মধ্য দিয়ে বিশেষ ধরনের সমাজকাঠামো তৈরি করা। তবে বিশেষ কোনো ধর্ম কোনো অবিনশ্বর ব্যাপার নয়; গত পাঁচ হাজার বছরে পৃথিবীতে কয়েক হাজার ধর্ম প্রস্তাবিত হয়েছে, অনেক ধর্ম কয়েক হাজার বছর ধ'রে প্রচলিত থেকে নতুন ধর্মের আক্রমণে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ধর্ম কি যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন? ধার্মিকেরাই স্বীকার করেন যে যুক্তি দিয়ে ধর্ম চলে না, ধর্ম চলে যুক্তিরহিত অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে; ধর্মে কোনো প্রশ্ন নেই, নতুন কোনো উত্তর নেই; সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়ে গেছে পুরোনো বইগুলোতে, সব সত্যের আকর হচ্ছে ওই বইগুলো।

তবে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের বইয়ে বিশ্বাস করে না, সাধারণত প্রচণ্ড বিরোধিতা করে, এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে ধর্মহীন ব'লেই গণ্য করে; আর সব ধর্মের মানুষই মনে করে ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার, সেখানে যুক্তি অচল। পৃথিবীতে সব কিছুই চলে যুক্তির সাহায্যে : গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে সব কিছুই চলে যুক্তির সাহায্যে, কোনো জ্ঞানই যুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়, কোনো সত্যই যুক্তি ছাড়া উদ্ঘাটন করা যায় না। অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে আমরা ধান উৎপাদন করতে পারি না, বিশ্বাস দিয়ে আমরা গাড়ি চালাতে পারি না, বা খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকোও তৈরি করতে পারি না; কিন্তু বিশ্বাস দিয়ে আমরা একটি অসামান্য কাজ করতে পারি;– মৃত্যুর পর যেতে পারি চিরসুখের জগতে। মানুষের শুধু একটি এলাকাই আছে, যেখানে যুক্তি চলে না; সেটি খুবই ভিন্ন রকম এলাকা, সেখানকার সব সত্য লাভ করা যায় অযুক্তি আর অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে। মানুষের এই অন্ধ বিশ্বাসই অভিহিত হয়ে থাকে ধর্মানুভূতি নামে।

মানুষের ধর্মানুভূতিগুলো অভিন্ন নয়, যেহেতু ধর্ম একটি নয়; অজস্র ধর্মবিশ্বাসে পৃথিবী বিব্রত। একেক ধর্মের মানুষের ধর্মানুভূতি একেক রকম, আবার একই ধর্মের ভেতরে রয়েছে বহু উপগোত্র, এবং বিভিন্ন উপগোত্রের ধর্মানুভূতি বিভিন্ন। প্রতিটি ধর্মেই দেখা যায় সাধারণ বিশ্বাসীরা ধর্মের মুলকথাগুলো ঠিকমতো জানে না, তারা ধর্মে সংযোজিত করে নানা নতুন বিশ্বাস, যেগুলোর সাথে ধর্মের মুল বিশ্বাসগুলোর সম্পর্ক নেই। অজস্র ব্যাপার জড়ো হয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় এক ধরনের যুক্তিরহিত বোধ, যাকে বলা হয় ধর্মানুভুতি। এই ধর্মানুভুতিই আহত হয়, এর গায়েই সাধারণত আঘাত লাগে।

> ধর্মানুভূতিতে যে আঘাত লেগেছে, তা যে আহত হয়েছে, তা বোঝার ও পরিমাপ করার কোনো উপায় নেই। অযৌক্তিক ব্যাপারকে যুক্তির সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র এখন যেভাবে চলছে, তাতে প্রতিটি ধার্মিকের ধর্মানুভূতি প্রতিমুহুর্তেই আহত হ'তে পারে, এবং হচ্ছে ।

পৃথিবীতে সম্ভবত এখন বিশুদ্ধ ধার্মিক নেই, থাকলে তাদের ধর্মানুভুতি খুবই আহত হতো। যেমন, মন্দির দেখে আহত হ'তে পারে একজন ধার্মিক মুসলমানের ধর্মানুভুতি, কেননা তার বিশ্বাসের জগতে মন্দির থাকতে পারে না; আবার মসজিদ দেখে আহত হ'তে পারে একজন ধার্মিক হিন্দুর ধর্মানুভুতি, কেননা তার বিশ্বাসে মসজিদ অবাঞ্ছিত। একজন খাঁটি মুসলমান যদি দাবি করে যে মন্দির দেখে তার ধর্মানুভুতি আহত হয়েছে, তাই মন্দিরটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে, তখন রাষ্ট্র কী করবে; একজন খাঁটি হিন্দু যদি দাবি করে যে মসজিদ দেখে তার ধর্মানুভুতি আহত হয়েছে, তখন কী করবে রাষ্ট্র? খাঁটি ধার্মিকের কোমল ধর্মানুভূতি আহত হ'তে পারে প্রতিমুহুর্তেই; টেলিভিশন,

সিনেমা, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের, সংসদে নারীদের দেখে আহত হ'তে পারে তার ধর্মানুভূতি, এবং সে এসব নিষিদ্ধ করার জন্যে আবেদন জানাতে পারে। পৃথিবী ও গ্রহগুলো ঘোরে সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে 'বিগ ব্যাং' বা মহাগর্জনের ফলে, সেটি হঠাৎ সৃষ্টি হয় নি, হয়েছে আজ থেকে এক হাজার থেকে দু-হাজার কোটি বছর আগে, তারপর থেকে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে, সূর্য আর গ্রহগুলো উদ্ভুত হয়েছে সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে, মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসে নি, বিবর্তনের ফলে বিকশিত হয়েছে বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে, পাহাড়গুলো পেরেক নয় ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক সত্য বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়;– এগুলোতে প্রচণ্ডভাবে আহত হ'তে পারে ধার্মিকদের ধর্মানুভূতি, তারা এগুলো নিষিদ্ধ করার জন্যে দাবি জানাতে পারে। তখন রাষ্ট্র কী করবে? রাষ্ট্র কি নিষিদ্ধ করবে বিজ্ঞান? তারপর ধর্মানুভূতি যেহেতু সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, তাই তা কতোটা আহত হলো, তা পরিমাপ করার উপায় নেই। যুক্তি দিয়ে অযুক্তিকে মাপা যায় না।

কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস বা ভাবাদর্শ পোষণ, লালন, সংরক্ষণ কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব? রাষ্ট্র যদি কোনো ভাবাদর্শ চাপিয়ে দেয় তার অধিবাসীদের ওপর, তাহলে তা হবে ভাবাদর্শগত স্বৈরাচার। সব ধরনের ভাবাদর্শই সন্দেহজনক ও পীড়নমূলক, আর পৌরাণিক ভাবাদর্শগুলো শুধু পীড়নমূলকই নয়, সেগুলো মানুষকে ক'রে রাখে অন্ধ, তার মননশীলতাকে ব্যাহত ক'রে তাকে বিকশিত হ'তে দেয় না। জ্ঞানের যে-বিকাশ ঘটেছে গত কয়েক শো বছরে, তা সহজে ঘটে নি; পৌরাণিক ভাবাদর্শগুলো পদেপদে বাধা দিয়েছে জ্ঞানের বিকাশে; বহু জ্ঞানীকে পীড়ন করেছে, পৌরাণিক ভাবাদর্শবাদীরা হত্যা করেছে বহু জ্ঞানীকে। পরে দেখা গেছে জ্ঞানীরাই ছিলেন ঠিক পথে, ভুল ছিলো পৌরাণিক ভাবাদর্শ, কিন্তু তা ছিলো শক্তিমান ও নির্মম। পৌরণিক ভাবাদর্শের যদিও কোনোই বাস্তব ভুমিকা নেই মানুষের জীবনে, তবু তা আজো শক্তিমান হয়ে আছে রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোর পাহারায়। জ্ঞানীর জ্ঞানের থেকে রাষ্ট্রের কাছে বেশি মুল্যবান হয়ে আছে অন্ধের ভুল বিশ্বাস। আজকের বিজ্ঞানের যুগেও পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোকে প্রবল ক'রে তোলা হচ্ছে, মাতিয়ে তোলা হচ্ছে মানুষকে পৌরাণিক বিশ্বাস দিয়ে; এবং পরিহাসের বিষয় হচ্ছে অসামান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোই ব্যবহৃত হচ্ছে পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোর প্রচারে। পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোর পক্ষে যে-কোনো অসত্য প্রচার করা যায়, এবং প্রচার করা হচ্ছে নিয়মিত, কিন্তু চরম সত্যও বলা যায় না, যা বিরুদ্ধে যায় পৌরাণিক বিশ্বাসের। আজকাল বই, পত্রপত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে নিরন্তর প্রচারিত হচ্ছে পৌরাণিক বিশ্বাস, যার কোনো যুক্তিগত ভিত্তি নেই, যেগুলোর অধিকাংশই হাস্যকর নিরর্থক কথা; কিন্তু পৌরাণিক বিশ্বাসের বিপক্ষে একটি কথাও বলা যায় না বেতার ও টেলিভিশনে। জ্ঞানের বিকাশের অর্থই হচ্ছে পুরোনো পৌরাণিক বিশ্বাসগুলোকে আহত করা, শুধু আহত নয় সেগুলোকে সম্পূর্ণ

বাতিল করা; কিন্তু রাষ্ট্রগুলো জ্ঞানের সুবিধাগুলো নিচ্ছে, কিন্তু পরিহার করছে তার চেতনাকে, এবং পোষণ ও পালন ক'রে চলছে পৌরাণিক বিশ্বাস।

মানুষ কোনো ধর্ম বা ধর্মানুভূতি নিয়ে জন্ম নেয় না; কিন্তু জন্মের পরই তার ওপর সক্রিয় হয়ে ওঠে পরিবারের ধর্ম বা ধর্মানুভূতি, এবং সে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় পরিবারের ধর্মগোষ্ঠিতে। মাবাবা, আত্মীয়স্বজন, এলাকা, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকা, রাষ্ট্রযন্ত্র তার ভেতরে ঢোকাতে থাকে ধর্ম ও ধর্মানুভূতি, পুলিশের মতো পাহারা দিতে থাকে তাকে, এবং তার মননশীলতাকে নষ্ট ক'রে সেখানে বিকাশ ঘটাতে থাকে যুক্তিহীনতা। সে যে-ধর্মের সদস্য সেটি যদি হয় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম, তাহলে তার ধর্মানুভূতি উগ্র থেকে উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। একটি প্রশ্ন ওঠে মাঝেমাঝেই যে যারা শিক্ষিত, জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকায় যাদের অনেকেই অর্জন করেছে সাফল্য, তারা কেনো ধর্মের মতো অযৌক্তিক বিশ্বাস পোষণ করে? তারা যে ধর্মবিশ্বাস পোষণ করে, এটাকেই মনে কর হয় ধর্মের সঠিকত্বের প্রমাণ। কিন্তু এটা কোনো প্রমাণ নয়। এ-ধরনের শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাও জন্ম নেয় বিশেষ পরিবারে, বাল্যকালে তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ভয় ও লোভ, তা থেকে তারা কখনো মুক্ত হ'তে পারে না; তারা যুক্তি ও অযুক্তির বিরোধিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। তারা বিরোধিতাটা বুঝতেও পারে না, কেননা মানুষ এমন অদ্ভুত প্রাণী, যে একই সাথে পোষণ করতে পারে পরস্পরবিরোধী চেতনা। ধর্ম যে শুধু পারলৌকিক অনন্ত সুখের লোভ দেখায়, তাই নয়; বাস্তব জগতেও নানা সুবিধা দেয়। প্রথা মেনে নিলে সুবিধা অনেক, না মানলে বিপদ অনেক। তাই সে ইহজাগতিক ও পরজাগতিক দু-রকম সুবিধার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাই শিক্ষিত, এমনকি বিখ্যাত মানুষদের ধর্মানুরাগও ধর্মের অভ্রান্ততার প্রমাণ নয়। ধর্ম যেহেতু ভালো ব'লে স্বীকৃত, তাই আশা করতে পারি যে ধার্মিক মানুষেরা সৎ মানুষ হবে; কিন্তু আমরা কি নিয়মিত দেখি না ধার্মিকদের শোচনীয় অসততা?

> বাঙলাদেশ এখন একটি প্রবল ধার্মিক দেশ; প্রার্থনালয়ে দেশ ছেয়ে গেছে, চারপাশ উপচে পড়ছে ধার্মিকে, উদ্দাম নাচগানের মধ্যে টেলিভিশন ব্যস্ত থাকছে ধর্মপ্রচারে, নেতানেত্রীরা তীর্থযাত্রার পর তীর্থযাত্রা করছেন, দিকে দিকে চলছে ধর্মের অলৌকিক উদ্দীপনা; তাই বাঙলাদেশ ভ'রে ওঠার কথা সততায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যাপক অসততা, অতুলনীয় দুর্নীতি, সীমাহীন ধর্ষণপীড়ন। ধর্ম ও সততা হওয়া উচিত ছিলো সমানুপাতিক; কিন্তু দেখা যা□ছ ধর্ম, ও অসততা, দুর্নীতি, ধর্ষণপীড়ন হয়ে উঠেছে সমানুপাতিক। তাহলে ধর্মানুভূতি কী দিচ্ছে আমাদের শুধু একরাশ অযৌক্তিক বিশ্বাস ছাড়া?

ধর্মানুভূতি কোনো নীরিহ ব্যাপার নয়, তা বেশ উগ্র; এবং এর শিকার অসৎ কপট দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নয়, এর শিকার সৎ ও জ্ঞানীরা; এর শিকার হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানের সাথে ধর্মের বিরোধ চলছে কয়েক সহস্রক ধ'রে, উৎপীড়িত হ'তে হ'তে জয়ী হচ্ছে জ্ঞান, বদলে দিচ্ছে পৃথিবীকে; তবু আজো পৌরাণিক বিশ্বাসগুলো আধিপত্য করছে, পীড়ন ক'রে চলছে জ্ঞানকে। ধর্মানুভূতির আধিপত্যের জন্যে কোনো গুণ বা যুক্তির দরকার পড়ে না, প্রথা ও পুরোনো বই যোগায় তার শক্তি, আর ওই শক্তিকে সে প্রয়োগ করতে পারে নিরঙ্কুশভাবে। উগ্র অন্ধ ধর্মানুভূতি বিস্তারের পেছনে কাজ করে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতি ও রাজনীতি। দরিদ্রের শিক্ষালাভের সুযোগ নেই, তাই জ্ঞানের সব এলাকাই তার অজানা; তার জ্ঞানহীন মনের ভেতর প্রতিবেশ সহজেই সংক্রামিত করে অযুক্তি ও অপবিশ্বাস; আর তাতে সে খুঁজে পায় শান্তি ও শক্তি। তার কিছু নেই ব'লে তার সাথে থাকে এক অলৌকিক মহাশক্তি, যা তাকে বাস্তবে কিছু দেয় না, কিন্তু মানসিকভাবে সবল ক'রে রাখে। দুর্নীতি ধর্মের পক্ষে কাজ করে; দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা নিজেদের অপরাধ ঢেকে রাখার জন্যে জাগিয়ে তোলে ধর্মীয় উগ্রতা। তাই সমাজে যতো দুর্নীতি বাড়ে ততো বাড়ে ধর্ম। রাজনীতিবিদেরাও ব্যবহার করে ধর্মকে; তারা দেখতে পায় ক্ষমতায় যাওয়ার সহজ উপায় ধর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি; তাদের কল্যাণ করতে হয় না মানুষের, বিকাশ ঘটাতে হয় না সমাজের– এগুলো কঠিন কাজ; সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ধর্মকে ব্যবহার ক'রে ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকা। কিন্তু এতে সমাজ নষ্ট থেকে নষ্টতর হ'তে থাকে, যা এখন ঘটছে বাঙলাদেশে। রাষ্ট্রকে মুক্ত হওয়া দরকার পৌরাণিক আবেগ থেকে, কেননা পৌরাণিক আবেগ গত কয়েক সহস্রকে মানুষের কল্যাণ বিশেষ করে নি, ক্ষতিই করেছে বেশি; এবং আজো ক্ষতি ক'রে চলছে।

[About the author: Dr. Humayun Azad is a living legend in the field of comparative literature. Besides authoring numerous Bangla poetry, novels, articles, comparative literature books, he is a staunch feminist and a fearless critic on HR violation issues. He is a rule-breaking freethinking author, poet, critic, column writer and head of Dhaka University Bangla department. At the request from one of our Moderators, he sent this above article "Dharmanubhutir Upakatha" (A tale of religious sensitivity), exclusively for Mukto-mona, a forum he follows closely.

© Copyright Mukto-mona. All rights reserved.